মহিমান্বিতা

(ঈমানদীপ্ত বিদুষী নারীদের জীবনভাষ্য)

ড. তারিক আস-সুয়াইদান

অনুবাদ : মাহমুদুল আহছান

তালবিয়া
প্র কা শ ন

সম্পাদনা
ড. মুহাম্মাদ রুহুল আমীন রব্বানী
ড. আব্দুল্লাহ আল মাসুদ
আতিফ আবু বকর

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২৩

ISBN: 978-984-96869-5-8

বিষয় সূচী

সারাহ ও হাজেরা	০৯
সাবা জাতির মহারাণী বিলকিস	১৫
মূসা আ. জীবনচক্রে বিদূষী নারীগণ	২১
মারইয়াম বিনতে ইমরান	৩০
রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনসঙ্গী আমাদের জননীগণ	৪২
খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ	৫৩
আয়িশা বিনতে আবু বকর	৬০
যয়নব বিনতে জাহাশ	৭৫
উম্মে হাবিবা রমলাহ বিনতে আবু সুফিয়ান	৮১
হাফসা বিনতে উমর	৮৪
জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস	৮৮
সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই	৯১
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যাগণ	৯৩
সুমাইয়া বিনতে খাইয়াত	১০১
আসমা বিনতে আবু বকর	১০৪
শহীদবধূয়া আতিকা বিনতে যায়িদ	১১০
উম্মে উমারাহ নুসাইবা বিনতে কাব	১১৯
আসমা বিনতে উমাইস	১২২
উম্মু সুলাইম বিনতে মিলহান	১২৫
ফাতিমা বিনতে আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান	১২৮
উম্মুল বানীন বিনতে আবদুল আযীয বিন মারওয়ান	১৩৯
রাণী যুবাইদা বিনতে জাফর	১৪৯
জান্নাতের সুবার্তাপ্রাপ্তা নারী সমাজ	১৫৮

বাংলা অনুবাদের ভূমিকা

অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতার বিপরীতে ইসলাম নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রশ্নে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। নারীকে অধিষ্ঠিত করেছে তার যথাযোগ্য স্থানে। এ জীবনবিধানে নারী পুরুষের সৃষ্টিগত পার্থক্যকে তাদের মর্যাদার মাপকাঠি হিসেবে নির্ধারণ না করে বরং কর্মকে তাদের মূল্যায়নের সূচকে পরিণত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٧﴾

মুমিন অবস্থায় পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকাজ করবে, অবশ্যই আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব। আর অবশ্যই আমরা তাদেরকে তারা যা করত তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দেব। (সূরা আন-নাহল ৯৯)

পৃথিবীর ইতিহাসে তাই পুরুষের পাশাপাশি নিজ কর্মগুণে অনেক নারী বিখ্যাত হয়েছেন। পরিণত হয়েছেন মহিমান্বিতা মহীয়সীতে। এমনই কয়েকজন ইতিহাসের অনন্যাকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এ গ্রন্থটিতে। বইটি গতানুগতিক কোন জীবনীগ্রন্থ নয়, বরং বিশ্বের ইতিহাসে ঈমানদীপ্ত অনন্য সাধারণ গুণের অধিকারী যেসব নারীদের কথা যারা বিশ্বের চেঞ্জমেকারদের সাথী হয়ে নিজ বিচক্ষণতা, বুদ্ধিদীপ্ততা ও নিঃস্বার্থ সহযোগিতার মাধ্যমে পৃথিবীকে বদলে দেয়ায় ভূমিকা রেখেছিলেন। তাদের ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হয়েছে এখানে।

আলোচিত নারী চরিত্রগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তাদের যোগ্যতা, পারদর্শিতা ও অবদানের বৈচিত্র পাওয়া যায়। কাউকে দেখা গেছে রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনায়। কেউবা রাষ্ট্রীয় সব জৌলুস ছেড়ে নিমগ্ন হয়েছেন সাধারণ জীবনযাপনে শুধুমাত্র দ্বীন পালনের জন্য। আবার কেউ নগ্ন তলোয়ার হাতে লড়াই করেছেন জিহাদের ময়দানে। কেউবা সাহিত্যচর্চা করে ইতিহাসের সেরা কবিদের কাতারে নিজের নাম লিখিয়েছেন। আবার কোন কোন রাজরাণীকে দেখা গেছে জনসেবার মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিতে। তবে অবদান ও কৃতিত্ব যাই থাক না কেন একটি স্থানে তাদের মধ্যে ভীষণ মিল রয়েছে, তারা সকলেই ছিলেন ঈমানের আলোয় আলোকিত। তাদের সকলের মূল উদ্দেশ্যই ছিল জীবনকে ঈমানের দাবিতে পরিচালনা করা।

গ্রন্থটির আলোচনায় এসেছেন নবী-রাসূলগণের সম্মানিতা মা, তাঁদের স্ত্রী, ইতিহাসের স্মরণীয়া বরণীয় কিছু নারী, বিখ্যাত সাহাবী ও পরবর্তী খলিফাগণের জীবনের সাথে জড়িত বিদুষী নারীগণ। কুরআন, হাদিস ও ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। কল্প কাহিনী, বাহুল্য আলোচনা ও উম্মাহর সামগ্রিক কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় নয় এমন বিষয়গুলো এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁদের প্রত্যেকে যেসব ব্যতিক্রম গুণাবলীর কারণে বিখ্যাত হয়েছিলেন সেগুলোকে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ঈমানদীপ্ত নারীদের নিয়ে রচিত এ গ্রন্থটি মূলত ডক্টর তারিক আস সুয়াইদানের একটি সিরিজ আলোচনার লিখিতরূপ। কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময় তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তিনি একাধারে একজন ইসলামী চিন্তাবিদ, মিডিয়াব্যক্তিত্ব, ব্যবসায়ী ও উম্মাহদরদী এক তারকা পুরুষ। তার লেখায় তিনি উম্মাহর হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার ও জ্ঞান বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধির

চেষ্টা করেন। নারী সমাজের আলোচনায় এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। মহিমান্বিতাদের আলোচনা করে তিনি সমসাময়িক মুসলিম নারীদের ঈমানের বলে জেগে ওঠার স্বপ্ন দেখিয়েছেন।

গ্রন্থটির অনুবাদ করেছেন প্রতিভাবান অনুবাদক ও উদীয়মান ইসলামী গবেষক মাহমুদুল আহসান সিএসএএ। অনুবাদের ক্ষেত্রে তার দক্ষতা বিশেষ করে শব্দ চয়ন সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। এক কথায় বলতে গেলে তিনি গ্রন্থটির অনুবাদের ক্ষেত্রে যথার্থ হক আদায় করেছেন। আল্লাহ তাআলা তার জীবন ও কর্মে বরকত দান করুন।

বইটির প্রকাশনী তালবিয়া প্রকাশন, জন্ম হয়েছে ব্যতিক্রম ও সময়োপযোগী বই প্রকাশের দায়বদ্ধতা নিয়ে। শুরু থেকেই তাই প্রকাশনীটি 'সংখ্যায় নয় গুণে বিশ্বাসী' হয়ে পথ চলছে। এ গ্রন্থটির প্রকাশ তারই একটি বড় প্রমাণ। আমি আশাকরি বইটির মাধ্যমে নারীসমাজ তাদের চেপে পড়া অনেক ইতিহাস জানতে পারবে। নিজেদের সাজাতে পারবে ইতিহাসের অনন্যাদের গুণে।

ড. মুহাম্মাদ রুহুল আমীন রব্বানী
মিরপুর, ঢাকা
অক্টোবর ২০২৩

সারাহ্ ও হাজেরা

ইবরাহীমপত্নী সারাহ

সারাহ আ. ছিলেন হযরত ইবরাহীম আ. এর চাচাত বোন। মানব ইতিহাসে হাওয়া আ. ছাড়া সারাহ আ. এর মত কোনো রূপসী দুনিয়ায় আর আসবে না। আমাদের মিল্লাতের পিতা ইবরাহীম আ. তাকে বিবাহ করেন। ইবরাহীম আ. নবুয়ত পেলেই সারাহ আ. তার প্রতি ঈমান আনেন। তার সাথে ইরাক থেকে ফিলিস্তিন হয়ে শাম পর্যন্ত দীর্ঘ সফর করেন। এরপর তাদের গন্তব্য হয় মিশর। তৎকালীন সময়ে মিশরের রাজত্ব করতো এক জালিম বাদশা। মিশরের বাদশার স্বভাব ছিল, সুন্দরী রমণীদের বিভিন্ন স্থান থেকে ধরে এনে তাদের ইজ্জত আব্রু হরণ করা। সে জানতে পারে এক অনিন্দ্য সুন্দরী মিশরে এসেছে। তার খায়েশ হয়, ঐ সুন্দরীর আব্রু হনন করার। আর এই নারী ছিলেন ইবরাহীম আ. এর মহিমান্বিতা স্ত্রী সারাহ আ.।

আল্লাহ সারাহর আব্রুর সুরক্ষা দিয়েছেন

বাদশা নির্দেশ দিলো সারাহকে ধরে আনার এবং সারাহর সাথের লোকটি যদি তার স্বামী হয়ে থাকে, তাহলে তাকে হত্যা করতেও আদেশ দিলেন। তার বাহিনী ইবরাহীম আ. এর কাছে হাজির হয়ে জানতে চাইলো, আপনার সাথে এই মহিলা কে? তিনি কৌশলী জবাব দিলেন, এ আমার বোন অর্থাৎ ধর্মীয় বোন। এরপরও ইবারাহীম আলাইহিস সালাম মুক্তি পেলেন না। শেষ পর্যন্ত তারা সারাহ আ. কে ছিনিয়ে নিয়ে তারা বাদশার হাতে অর্পণ করলো। সারাহ আ. আল্লাহর নিকট আর্তনাদ করে বললেন, 'হে আল্লাহ, আমি আপনার ও আপনার রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। হে আল্লাহ আপনি আমার আব্রুর সুরক্ষা প্রদান করুন। এই পাপাচারী লোকটিকে আপনি শায়েস্তা করুন।' তাৎক্ষণিকভাবে তার দোয়া আল্লাহর নিকট পৌঁছে গেল। জালিম বাদশাহ অসৎ উদ্দেশ্যে সারাহ আ. দিকে হাত বাড়াতে চাইলে তিনবারই হাতের চলৎশক্তি বিকল হয়ে গেল। ভীত বাদশা খুব কাকুতি মিনতি করে ক্ষমা চেয়ে নিস্তার পেলো। এরপর বাদশাহ দারোয়ানকে ডেকে বললো, 'এ তো মানুষ নয়। বরং কোন দৈত্যদানব! যাও একে আজাদ করে দাও।' এতদ্ব্যতীত হাজেরা নামক এক সুশ্রী বাঁদী উপহার দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করলেন। সারাহ আ. যখন হাজেরাকে নিয়ে হযরত ইবরাহীম আ. এর নিকট পৌঁছলেন তখন তিনি নামাযের মধ্যে ছিলেন।

হাজেরা ও সারাহর গল্প

ইবরাহীম আ. স্ত্রী সারাহ ও সেবিকা হাজেরাকে সাথে নিয়ে ফিলিস্তিনে বসবাস করতে শুরু করলেন। সেখানে তিনি অঢেল সম্পত্তি অর্জন করলেন। বার্ধক্যে উপনীত হলেও সারাহ আ. এর গর্ভে এ পর্যন্ত কোন সন্তান জন্ম নেয়নি। তিনি স্বামীর এ শুন্যতা অনুভব করলেন। ফলে স্বামীর নিকট হাজেরাকে পেশ করে আরজ করলেন, আপনি একে বিবাহ করুন, তাহলে হয়তো তাঁর থেকে আপনার কোন সন্তান হবে। ইবরাহীম আ. তাকে আজাদ করে বিবাহ করলেন। হাজেরা আ. এর গর্ভে হযরত ইসমাঈল আ. এর জন্ম হয়।

হাজেরা ও ইবরাহীমের কাহিনী

ইসমাইল আ. এর জন্মের সময় ইবরাহীম আ. এর বয়স ছিল ৮৬ বছর। তার নিকট ইসমাইল ছিল সাতরাজার ধন। এরপর একদিন আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম আ. কে এক মহাপরীক্ষায় ফেললেন। ইবরাহীম আ. কে পুত্র ইসমাইল এবং স্ত্রী হাজেরাকে নির্জন মরুপ্রান্তরের পাহাড়ী উপত্যকায় রেখে আসার নির্দেশ দিলেন।

হাজেরার আশার প্রতীক

আজকের মক্কা যেখানে ইবরাহীম আ. তার স্ত্রী হাজেরা আ. ও শিশু সন্তান ইসমাইলকে কোন সঙ্গী-সাথীহীন রেখে ফিরে যেতে লাগলেন। তখন ইসমাঈলের মা হাজেরা তার পিছু পিছু ছুটলেন। আর আর্তচিৎকার করে ডাকতে লাগলেন। ইবরাহীম আ. সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। তখন মা হাজেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা

করলেন, 'আল্লাহ কি আপনাকে এর হুকুম দিয়েছেন?' তিনি উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ।' উত্তর শুনে মা হাজেরা বললেন, 'তাহলে তিনি আমাদেরকে ধ্বংস ও বরবাদ করবেন না।'

বিনা প্রশ্নে আল্লাহর আদেশ - নিষেধের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণই ইসলাম। তার অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন মা হাজেরা ও ইবরাহীম আ.। আমরা যদি আল্লাহর আদেশের সম্মুখে এমন আত্মসমর্পণ করি এবং তার দ্বীনের অনুকরণ করি তবে আমরা বিলীন হয়ে যাব না। আল্লাহর দ্বীন ব্যতীত অন্য মত-পথ-মতান্তরের অনুসরণে আমরা নিজেদের সত্ত্বাকে হারিয়েছি। আমাদের সভ্যতা, আমাদের মর্যাদা এবং আমাদের ভবিষ্যত আল্লাহর দ্বীনের অনুসরণে নিহিত রয়েছে। আল্লাহর ছায়াঘন আশ্রয়ে নিরাপত্তাহীনতা, দারিদ্র্য, ক্ষুধা বা পশ্চাৎপদতা নেই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের কোন বিপুলাকায় কর্তৃত্বের পরোয়ানার অস্তিত্ব সেখানে থাকে না।

সাফা–মারওয়া পর্বতে মা হাজেরার ছুটাছুটি

বৃক্ষ-তরুলতা ও জনমানবিহীন এই প্রান্তরে হাজেরা আ. শিশু পুত্রকে নিয়ে বসবাস করতে লাগলেন। একসময় সঙ্গে আনা খাদ্য-সামগ্রী ও মশকের পানি ফুরিয়ে গেলো, তিনি নিজেও পিপাসার্ত হলেন। বুকের দুধ শুকিয়ে যাওয়ায় শিশুপুত্র পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল। শিশু পুত্রের করুণ অবস্থা তিনি সহ্য করতে পারলেন না। তিনি সাফা পর্বতের উপরে উঠলেন, উপত্যকার দিকে মুখ করে এদিক ওদিক খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু কোন জনমানবের দেখা পেলেন না। এরপর সাফা পর্বত থেকে দৌড়ে উপত্যকা পার হলেন। অতঃপর 'মারওয়া' পাহাড়ের উপরে উঠেলেন। চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে বহু খুঁজলেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। এভাবে তিনি বিপদসংকুল মরু অঞ্চলের এ পর্বতদ্বয়ের মাঝে অত্যন্ত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে সাতবার দৌড়াদৌড়ি করলেন। রব্বুল আলামীন পর্বতময় জমীনে হাজেরা আ. কষ্টের সফরকে এতোটা পছন্দ করলেন যে, হজ ও উমরাকারীদের জন্য সাফা-মারওয়া সায়ী করা বা দুই পর্বতের মধ্যে সাতবার দৌড়াদৌড়ি করার চিরস্থায়ী প্রচলন করে দিলেন। মা হাজেরার দৌড়ানো থেকে হজ ও উমরা পালনকারীদের জন্য সাফা-মারওয়া পাহাড়ে সাঈ ও ছোটাছুটির প্রচলন শুরু হয়। এ যেন হজের পবিত্রস্থানে গিয়ে শিশুপুত্রের সুরক্ষায় একজন মায়ের আবেগীয় টানের স্মরণিকা, দ্বিধামুক্ত হয়ে আল্লাহ তায়ালার আদেশ পালন, মানুষের অসহায়তায় আল্লাহর নির্ভরতা ও দুনিয়ার তুচ্ছার্থ বোধের অনুশীলন। হাজেরা আ. এর কাকুতি-মিনতি দোয়া রোনাজারির শিক্ষাকেই আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহর জন্য তুলাদণ্ড নির্ধারণ করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনসঙ্গী
মুমিনদের জননীগণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মীনী ও মুমিনদের জননীগণ তো তারাই যাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সৃষ্টির সেরা মানবের স্ত্রী হিসেবে বাছাই করেছেন। তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁদের মর্যাদা সমুন্নত করেছেন। ফলে তারা শ্রেষ্ঠ রাসূলের উত্তম জীবনসঙ্গী হিসেবে মনোনীত হয়েছেন। তাঁদের জীবনাচার মুমিন মুমিনাদের আদর্শে পরিণত হয়েছে।

উম্মুল মুমিনীনের সংখ্যা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মোট স্ত্রী ছিলেন তের জন। তাদের মধ্যে এগারো জনের সাথে বিবাহ ও সংসার হয়েছিল। বাকি দু'জনের সাথে বিবাহ হয়েছিল কিন্তু সংসার হয়নি। তারা দু'জন হলেন,

১. আমরা বিনতে জাওন; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকটবর্তী হতে গেলে সে বলল, আমি আপনার হাত থেকে পানাহ চাই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মুক্ত করে দেন।

২. ফাতিমা বিনতে দাহহাক; তিনি নিজেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য সমর্পণ করেছিলেন। তার কোমরে শ্বেতীর সাদা দাগ ছিলো। বিবাহের আকদ হলেও তার সাথে সংসার হয়নি। পরবর্তীতে কুরআনের আয়াতকে মোহরানা নির্ধারণ করে অন্য স্বামীর সাথে তার বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

উম্মুল মুমিনীনগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

১. খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ রাদিআল্লাহু আনহা

আম্মাজান খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ আল কুরাইশিয়্যাহ আল আসাদিয়্যাহ রাদিআল্লাহু আনহা ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রথম স্ত্রী। মক্কার কুরাইশ গোত্রে তিনি আভিজাত্য ও চারিত্রিক নিষ্কলুষতায় সুবিখ্যাত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তাঁর ব্যবসায়িক প্রতিনিধি নির্ধারণ করেন। এতে তিনি নবীজির আমানতদারিতা ও সদাচারপ মুগ্ধ হন। এবং বিয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করেন। বিবাহ অনুষ্ঠানের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বয়স ছিল ২৫ বছর ও মা খাদীজা রাদিআল্লাহু আনহার বয়স ছিল ৪০ বছর। এ দম্পতির সংসার জীবন ছিলো ২৫ বছর। নুবুওয়াতের দশম বছরে খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইন্তেকাল করেন। সে পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কোন নারীর পানিগ্রহণ করেননি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন,

> আল্লাহ তার চেয়ে উত্তম নারী আমাকে আর দান করেননি। মক্কার মানুষেরা যখন আমার কথা মানতে স্বীকৃতি জানিয়েছিল, তখন সে সবার আগে আমার প্রতি ঈমান এনেছে। আমার নুবুওয়ত নিয়ে মানুষ যখন আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, তখন সে আমার নুবুওয়াতের সত্যায়ন করেছে। মানুষ যখন আমাকে বঞ্চনায় তাড়িয়ে দিয়েছে তখন সে আমাকে তার সম্পদ দিয়ে ভরসা যুগিয়েছে। আল্লাহ অন্য স্ত্রীদের গর্ভব্যতীত তার মাধ্যমে আমার অনেক সন্তান দান করেছেন।
> (বুখারী ৩৮২১ ও মুসলিম ২৪৩৭)

তিনি ছিলেন দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম পূর্ণাঙ্গ মানবী। আল্লাহ তাকে দুনিয়ায় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্তদের মাঝে শামিল করেন। খাদীজার প্রতি রাসূলের গভীর ভালোবাসা ছিল। তার পরলোকগমনের পরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ভালোবাসায় প্রীত হতেন ও তাকে অনেক বেশি স্মরণ করতেন।

২. সাউদা বিনতে জামআ আল কুরাইশিয়্যাহ রাদিআল্লাহু আনহা

খাদীজা রাদিআল্লাহু আনহা ইন্তেকালের পর নবীজি সাউদা রাদিআল্লাহু আনহা কে বিয়ে করেন। তাঁর প্রথম স্বামী সাকরান ইবনে আমরের মৃত্যুর পর সাউদা বিনতে জামআ বিধবা ও নিঃস্ব হয়ে পড়েন। এ সময় প্রস্তবনার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে আম্মাজান সাউদা রাদিআল্লাহু আনহা এর বিবাহ হয়। তিনি নবীজির ঘর, পরিবার ও কন্যাদের আপন ভালোবাসায় আগলে রাখেন। বয়োবৃদ্ধতার কারণে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বিধানের জন্য বণ্টিত যে অংশ তাঁর ভাগে ছিলো, সে অংশ তিনি আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা কে দিয়ে দেন।

৩. আয়েশা বিনতে আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহা

প্রিয় বন্ধু আবু বকর সিদ্দীকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন স্বরূপ তিনি তাঁর উত্তম কন্যা আয়েশা বিনতে আবু বকরকে বিয়ে করেছিলেন। তাছাড়া তিনি স্বপ্নের মাধ্যমেও এ বিয়েতে আদিষ্ট হয়েছিলেন। আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একমাত্র সৌভাগ্যবতী কুমারী ও সর্বকনিষ্ঠ স্ত্রী। তিনি ছিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রিয়দের মাঝে প্রিয়তমা স্ত্রী। আম্মাজান আয়েশার ছিলো প্রভূত প্রতিভা! প্রখর স্মৃতিশক্তি, প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞতায় শীর্ষ ধর্মবেত্তা। বিজ্ঞ সাহাবী ও তাবেয়ীগণ তার অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার থেকে মাসআলা জিজ্ঞাস করার জন্য আগমন করতেন। ইফকের ঘটনায় তার নিষ্কলুষতা ও দায়মুক্তির ঘোষণা দিয়ে কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা আয়াত অবতীর্ণ করেন। তার কোলে মাথা রাখা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেন।

৪. হাফসা বিনতে উমর বিন খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহা

স্বামী খোনাইস ইবনে হুযাফার ইন্তেকালের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে তার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। তার পিতা উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর প্রতি এহতেরাম ও সম্মান প্রদর্শন ছিল এই বিয়ের উদ্দেশ্য। সমবয়সী হওয়ার কারণে তিনি আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা এর প্রিয়সঙ্গিনী ছিলেন। তিনি বিদূষী ও ইবাদাতগুজারী ছিলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর খেলাফতকালের সংকলিত কুরআনের মুসহাফটি তাঁর নিকট সংরক্ষিত ছিল।

৫. যয়নব বিনতে খুযায়মা ইবনে হারিস রাদিআল্লাহু আনহা

অসহয় মিসকীনদের প্রতি গভীর মমত্ববোধের কারণে তিনি 'উম্মুল মাসাকিন' বা দুঃখীদের জননী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ওহুদ যুদ্ধে তার স্বামী আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শাহাদাতবরণ করেন। এরপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে তার বিবাহ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে মাত্র দুই বা তিন মাস দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৬. উম্মে সালামাহ হিনদ বিনতে আবি উমাইয়া রাদিআল্লাহু আনহা

উম্মে সালামাহ হিনদ বিনতে আবি উমাইয়া আল কুরাইশিয়্যাহ আল মাখযুমিয়্যাহ ও তার স্বামী ইসলামের কালেমাপাঠে ধন্য হন। এ দম্পতি প্রথমে হাবশা ও পরবর্তীতে মদীনায় হিজরাত করেন। তার স্বামী আব্দুল্লাহ ইবনে আবুল আসাদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ওহুদের যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিবাহ করেন। তিনি নবীজির অন্যান্য স্ত্রীদের তুলনায় বয়সে বড় ছিলেন। উম্মে সালামাহ বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ক্ষমতায় মদীনায় বিখ্যাত ছিলেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় তার বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত তাকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দেওয়ার পরও সাহাবীরা চুপ হয়ে বসেছিলেন। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে পরামর্শ দিয়ে বললেন, আপনি নিজের মাথার চুল কামিয়ে ফেলুন এবং নিজের পশু কোরবানি করুন। এরপর সাহাবীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুকরণে ইহরাম থেকে মুক্ত হন।

৭. যয়নব বিনতে জাহাশ রাদিআল্লাহু আনহা

যয়নব রাদিআল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ফুফাতো বোন ছিলেন। তিনি উচ্চবংশীয়া ও রূপবতী নারী ছিলেন। আরবীয় সমাজে প্রচলিত বংশীয় কৌলিন্য রক্ষার রীতিনীতি দূর করার জন্য তিনি পালকপুত্র এবং একান্ত সেবক যায়িদ ইবনে হারিসার সাথে যয়নবের বিবাহের পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ের পর দুইজনের মনের মিল হচ্ছিল না কিছুতেই। একপর্যায়ে যায়িদ যয়নবকে তালাক প্রদান করেন। তারপর আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর যয়নবকে বিবাহ করার ইলাহী নির্দেশ জারি করেন। এর মাধ্যমে পালক পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ না করার আরবীয় প্রচলিত কুসংস্কার অপসারিত হয়। যয়নব বিনতে জাহাশ দান-সদকায় ছিলেন প্রবাদতুল্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালের পর স্ত্রীদের মধ্যে সবার আগে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৮. জুয়াইরিয়্যাহ বিনতে হারিস রাদিআল্লাহু আনহা

তিনি ছিলেন বনু মুস্তালিকের দুর্গাধিপতি হারিস ইবনে জিরারের কন্যা। বনী মুস্তালিকের সাথে যুদ্ধ শেষে তিনি দাসী হিসেবে বণ্টিত হলেন বিজয়ী বাহিনীর সাবিত ইবনে কায়েস রাদিআল্লাহু আনহু ভাগে। তিনি সাবিত ইবনে কায়েসের নিকট হতে অর্থের বিনিময়ে তাকে মুক্ত করে দেওয়ার আবেদন করেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মুক্তিপণের অর্থ পরিশোধ করে তাঁকে স্ত্রী হিসেবে সম্মানিত করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রীর সম্মানে মুসলিমগণ বনু মুস্তালিক গোত্রের বন্দীদের দাসত্বের জিঞ্জির থেকে মুক্ত করে দেন। এভাবে তিনি তার গোত্রের জন্য সৌভাগ্য নিয়ে আসেন। আম্মাজান জুয়াইরিয়্যাহ বিনতে হারিস রাদিআল্লাহু আনহা অত্যন্ত ইবাদাতগুজারী ছিলেন। সবসময় জিকিরে মশগুল থাকতেন।

৯. উম্মে হাবিবা রমলাহ বিনতে আবু সুফিয়ান রাদিআল্লাহু আনহা

স্বামী ওবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশের সাথে তিনি হাবশায় হিজরত করেন। সেখানে ওবাইদুল্লাহ ইসলাম ত্যাগ করে প্রচলিত খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। এরপর সম্রাট নাজ্জাশীকে উকিল নিযুক্ত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে হাবিবার নিকট বিবাহের প্রস্তাব প্রেরণ করেছিলেন। উম্মে হাবিবা দৃঢ়প্রত্যয়ী ও রাসূলের প্রতি অন্তঃপ্রাণা ছিলেন। তিনি মুশরিক পিতাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিছানায় উপবেশনে বারণ করেন।

১০. সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাব রাদিআল্লাহু আনহা

তিনি ছিলেন মুসা আ. এর ভাই হারুন আ. এর বংশধর এক ইহুদি রাজকুমারী। খাইবার বিজয়ের পর দাসী হিসেবে মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে বণ্টিত হওয়ার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জন্য তাঁকে পছন্দ করেন এবং তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই বিবাহের মাধ্যমে ইসলামে আহলে কিতাব পুতপবিত্রা ও সতী নারীদের বিবাহের বিধান জারি হয়।

১১. মায়মুনা বিনতে হারিস আল হিলালিয়্যাহ রাদিআল্লাহু আনহা

৭ম হিজরিতে হজ ও উমরাহ 'উমরাতুল কাজা' আদায় করতে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে তার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা মায়মুনা রাদিআল্লাহু আনহা সম্পর্কে বলেন, 'তিনি আমাদের (উম্মুল মুমিনদের) মধ্যে খোদাভীতি ও আত্মীয়তার সম্পর্ক সুরক্ষায় অনন্য উচ্চতায় উচ্চকিত ছিলেন।' তিনি সেই সৌভাগ্যবতী যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ বিবাহ করেন।

এই এগারোজন মহিয়সীর সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর বেধেছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁদের দুজন - খাদীজা ও যয়নব বিনতে খুযায়মা ইন্তেকাল করেন। বাকি নয় জন নবীজীর ইন্তেকালের মুহূর্তে জীবিত ছিলেন।

যে দাসীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রীর মর্যাদা পেয়েছেন

গৃহদাসীদের মধ্য থেকে দু'জনকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কাছে রেখছেলিন। তারা হলেন,

১. মারিয়া কিবতিয়া রাদিআল্লাহু আনহা

মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার রাজা মুকাওকিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য তাঁকে হাদিয়া স্বরূপ পাঠান। তার গর্ভে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পুত্র ইবরাহীম জন্মগ্রহণ করেন। যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশাতেই শৈশবে ইন্তেকাল করেন।

২. রায়হানা বিনতে যায়িদ নাযরিয়্যা বা কুরাইযিয়্যা রাদিআল্লাহু আনহা

তিনি বনী কুরাইযার বন্দিনী ছিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নিজের জন্য মনোনীত করেন। অনেকের মতে, তিনি দাসী নন; বরং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী। নবীজী তাঁকে আযাদ করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন।

মূসা আ. এর
জীবনে বিদূষী নারীগণ

মিসরের মাটিতে বনী ইসরাইল

আল্লাহর নবী ইউসুফ আ. এর সময় বনী ইসরাইলরা মিশরে আগমন করেন। তাদের বংশ বৃদ্ধির আশঙ্কায় মিশরের তৎকালীন ফিরাউনরা বনী ইসরাইলের ওপর নিপীড়ন শুরু করে। শাসকগোষ্ঠী বনী ইসরাইলের শিশুদের কঠিন শ্রমের নির্মাণ শিল্পে নিয়োগসহ ভয়ানক সবকাজে বাধ্য করে। বর্ণনা মতে তৎকালীন মিশরে বনী ইসরাইলের ছয় হাজার শিশুকে নিপীতিড় দাসত্বের জীবন বেছে নিতে বাধ্য করা হয়েছিলো।

এক রজনীতে মিশরের ফিরাউন স্বপ্নে দেখলো যে, বনী ইসরাইলের এক বালক তার রাজ্য ছিনিয়ে নেবে। অন্য বর্ণনায় এভাবে এসেছে যে, রাজার সৈন্য সামন্ত প্রচণ্ড ভীত হয়ে পড়লো, কারণ তারা আশঙ্খা করলো বনী ইসরাইলের জনসংখ্যা মিশরীয়দের অনুপাতে ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে তারা সিদ্ধান্ত নিলো, বনী ইসরায়েলের সদ্য প্রসূত শিশুদের হত্যা করা হবে। এক বছর পরপর এই হিংস্রতা কার্যকর করা হতো।

বনী ইসরায়েলের শিশুদের গলা কেটে হত্যা শুরু

জালিম ফিরাউন তার বাহিনী দিয়ে হত্যার জন্য নির্ধারিত বছরে জন্ম নেওয়া বনী ইসরাইলের প্রতিটি ছেলে শিশুকে গলা কেটে হত্যা করত। আল কুরআনে এই জুলুমের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এভাবে,

وَ اِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَ فِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿۴۹﴾

> এবং যখন আমি তোমাদেরকে ফির'আউনের সম্প্রদায় হতে বিমুক্ত করেছিলাম - তারা তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করত, তোমাদের পুত্রদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের কন্যাদেরকে জীবিত রাখত এবং এতে তোমাদের রবের পক্ষ হতে তোমাদের জন্য মহা পরীক্ষা ছিল। (আল-বাকারা ৪৯)

মূসা আ. এর জননী

এই ভীতিকর প্রতিবেশে আল্লাহর নবী মূসা আ. এর জন্ম হয়। তার মা সন্তানের জীবন নিয়ে খুব ভীত এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছিলেন। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তখন তার কাছে ইলহাম এলো,

> আমি মূসার মায়ের অন্তরে ইঙ্গিতে নির্দেশ করলাম, শিশুটিকে তুমি স্তন্য দান করতে থাক; যখন তুমি তার সম্পর্কে কোন আশংকা করবে তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ কর এবং ভয় করো না, দুঃখ করো না; আমি তাকে তোমার নিকট ফিরিয়ে দেব এবং তাকে রাসূলদের একজন করব। অতঃপর ফির'আউনের লোকজন তাকে কুড়িয়ে নিল। এর পরিণামতো এই ছিল যে, সে তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হবে। ফির'আউন, হামান ও তাদের বাহিনী ছিল অপরাধী। মূসা-জননীর হৃদয় অস্থির হয়ে পড়েছিল; যাতে সে আস্থাশীল হয় তজ্জন্য আমি তার হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিলে সে তার পরিচয়তো প্রকাশ করেই দিত। (আল-কাসাস : ৭-১০)

মূসার মা সন্তানের চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েছিল। একেবারে অস্থির বা ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন। এ জন্য আল্লাহ তায়ালা তাকে ইলহামের মাধ্যমে সবর করতে বলেন।

আছিয়া বিনতে মুজাহিম

ফিরআউনের স্ত্রী আছিয়া ছিলেন একজন ঈমানদার নারী। তার রূপের বর্ণনা শুনে ফিরাউন তাকে জোরপূর্বক দাসী করে রাখতে চেয়েছিল। নিজের পরিবারের স্বার্থে আছিয়া নিজেকে কুরবানী করেছিলেন। ঐ সময়ের সবচেয়ে বড় কাফেরের সাথে বাস করেও তিনি ঈমানহারা হননি। বরং তাকে ঘৃণা করতেন। আছিয়া সন্তানের জন্য ব্যাকুল ছিলেন। তাই কাঠের বাক্সের ভিতর সুন্দর শিশু মূসাকে দেখে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এই শিশুকে তিনি নিজ সন্তান হিসেবে গ্রহণ করছিলেন।

আসমা বিনতে আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহা

ইসলামে নারীর যথাযথ সম্মান দেওয়া হয়েছে এবং তাদের মর্যাদার মিনারা করা হয়েছে সমুন্নত। ফলে ইসলামের ইতিহাসে নারীরা সম্মানের সাথে স্মরণীয় হয়েছেন। আলোচনার এ অংশে আমরা দুই ফিতাওয়ালী লকবপ্রাপ্তা সেই মহিমান্বিতার কথা আলোচনা করব যার নাম আসমা বিনতে আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহা। যিনি বহুতর গুণের অধিকারী ছিলেন। নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন, পরিবার রক্ষণাবেক্ষণ, বাতিলের বিরুদ্ধে দৃঢ়পদ অবস্থান, ন্যায়ের মিছিলে দাওয়াতের পথে ত্যাগ ও কোরবানীর ক্ষেত্রে ইসলামী সভ্যতা ও নারী জাতির মাঝে অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন।

আসমা বিনতে আবু বকরের ইসলামগ্রহণ

আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর স্ত্রী কুতীলার গর্ভে আসমা রাদিআল্লাহু আনহা জন্মগ্রহণ করেন। তার বৈমাত্রীয় বোন আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা জন্ম হয় উম্মে রোমানের গর্ভে। আসমা রাদিআল্লাহু আনহা আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা এর চেয়ে প্রায় চৌদ্দ বছরের বড় ছিলেন। তিনি ইসলামগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রথম সারিতে ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে তার ধারাক্রম ছিলো সতেরো। ইসলাম গ্রহণকালে আসমা বিনতে আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহা এর বয়স ছিলো পনের বছর।

আসমা রাদিআল্লাহু আনহা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট থেকে ইসলামের বিধিবিধানের দীক্ষা পেয়েছেন। তিনি স্বীয় পিতা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সাথে বসবাস করতেন। কুরাইশদের দেওয়া দুঃখ কষ্ট সবরের সাথে মোকাবেলা করেন। পরিবার ও পিতার পাশে থেকে অভয় দিতেন, শক্তি যোগাতেন। অনাগত সুখের আশ্বাস দিতেন। ছোট বোন আয়েশার প্রতি ছিলেন রহমদীল তাকে মাতৃস্নেহে লালন করছিলেন।

আসমা বিনতে আবু বকরের স্বামী

হিজরতের অল্প সময় পূর্বে ইসলামের ইতিহাসের এক মহান ব্যক্তিত্ব জুবায়ের ইবনে আওয়াম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সাথে তার শুভ পরিণয় হয়। খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাদিআল্লাহু আনহা তাঁর ফুফু এবং সাফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব রাদিআল্লাহু আনহা তাঁর মাতা ছিলেন। সে হিসেবে তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ফুফাতো ভাই।

হিজরতে আসমা বিনতে আবু বকরের কৃতিত্ব

আসমা বিনতে আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহা সেই কজন ব্যাক্তির একজন যারা নবীজির হিজরত সঙ্ঘটনের ব্যাপারটি জানতেন ও সরাসরি সহযোগী ছিলেন। বিশেষ এই বিষয়টি নবীজির নির্দেশনা মোতাবেক তিনি গোপন রেখেছিলেন। হিজরতের সংবাদ নিয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর গৃহে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসেন তখন আসমা এবং তার বোন উপস্থিত ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কে হিজরতের দিন-তারিখ এবং হিজরতের সফরসঙ্গী হিসেবে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নির্বাচন করার খবর দেন। আসমা রাদিআল্লাহু আনহা তখন প্রাপ্তবয়স্কা। তিনি হিজরতের তাৎপর্য অনুধাবন করেছিলেন। এই সংবাদ প্রকাশ রাসূলের জীবনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে সে ব্যাপারেও সর্তক হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার পিতা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সাথে সাওর গুহায় অবস্থান করছিলেন, তখন আবু জাহলের নেতৃত্বে কুরাইশদের একটি চক্র আবু বকরের গৃহে যায়। আসমা রাদিআল্লাহু আনহা দরজা খুলে ঘরের বাইরে আসলে তারা জিজ্ঞাসা করলো, হে আবু বকরের মেয়ে, তোমাদের পিতা কোথায়? তিনি বললেন, আমি জানি কী করে? তখন দুরাত্মা আবু জাহেল তার গায়ে হাত তুলে বসে। আসমা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, আবু জাহল আমাকে এত জোরে এক চড়ে মারল যে, আমার কানের দুল খুলে ছিটকে পড়ে। তারপর রাগে গজগজ করতে করতে তারা চলে যায়।

উম্মে উমারাহ
নুসাইবা বিনতে কাব রাদিআল্লাহু আনহা

উম্মে উমারাহ রাদিআল্লাহু আনহা এর ইসলাম গ্রহণ

আকাবার শপথে যে সকল ভাগ্যবান ইয়াসরিববাসী উপস্থিত থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে দুজন মহৎপ্রাণ নারী উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। নুসাইবা বিনতে কাব আল আনসারিয়্যাহ রাদিআল্লাহু আনহা ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ইসলামের স্নিগ্ধ ছায়াতলে অংশগ্রহণকারী প্রথম দিকের আনসার সাহাবীদের তিনি একজন। নবীজির হিজরতের পর ওহুদ যুদ্ধের মুহূর্তে উম্মে উমারাহ তার বর্তমান স্বামী গাযিয়্যাহ ইবনে আমর এবং পূর্বের স্বামী যায়েদ ইবনে আসেমের ঔরসজাত দু'সন্তান আব্দুল্লাহ ও হাবিবসহ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেকালে নারীরা সরাসরি রণক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতো না। বরং আহতদের চিকিৎসা করা, পিপাসার্ত যোদ্ধাকে পানি পান করানোসহ অন্যান্য যুদ্ধকালীন পরিপূরক কাজে অংশগ্রহণ করতেন।

উম্মে উমারাহ-এর ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ

এ যুদ্ধের প্রথমভাগে মুসলমানদের বিজয় হয়। কিন্তু টহলরত তীরন্দাজ সৈন্যরা তাদের পাহারাস্থান গিরিপথ ত্যাগ করার ফলে, (তখন পর্যন্ত অমুসলিম) খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বাধীন সৈন্যরা ঐ গিরিপথ দিয়ে চোরাগুপ্তা হামলা চালিয়ে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হামলার ফলে মুসলিম সৈন্যরা রণে ভঙ্গ দেয়। আহত হয়ে সাহাবীরা এদিকওদিক ছোটাছুটি করতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুরক্ষায় তার সাথে মাত্র দশ জন সাহাবী অবশিষ্ট থাকলেন। এ ভাগ্যবান ও নির্ভিক সাহাবীদের মধ্যে নুসাইবা রাদিআল্লাহু আনহা, তার স্বামী গাযিয়্যাহ ইবনে আমর রাদিআল্লাহু আনহু এবং তার দু'সন্তান আব্দুল্লাহ ও হাবিব ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুরক্ষায় তিনি অজেয় পুরুষের ন্যায় নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। পুত্র আবদুল্লাহ তীর বিদ্ধ হয়ে মারাত্মকভাবে আহত হন; তা সত্ত্বেও এ বীরপ্রসূ জননী ক্ষতস্থানে পট্টি বেঁধে তাকে লড়াই চালিয়ে যেতে নির্দেশ দেন। তার ত্যাগ আর বীরত্ব দেখে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমি ডানে-বামে যেদিকে তাকাই দেখি উম্মু উমারাহ আমাকে নিরাপদ রাখার জন্য লড়াই করে যাচ্ছে।'

এ ভয়ংকর যুদ্ধ থেকে পুরুষ সৈন্যদের পালানোর মুহূর্তে তিনি রণক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে টিকেছিলেন। তার শরীরে ১৩টি আঘাত লাগে যা ছিলো গুরুতর। মুহুর্মুহু আঘাতের প্রচণ্ডতায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গহ্বরে নেমে পড়লেন। দুর্ভাগা ইবনে আবি ক্বামিয়াহ নবীজির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে নুসাইবা বিনতে কাব রাদিআল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুরক্ষায় মানব ঢালরূপে আবির্ভূত হলেন। ইবনে আবি ক্বামিয়াহ নুসাইবার বাহু ও কাঁধে আঘাত হানার ফলে তার কাঁধ-গলা চটের মতো চিরে গেলো। শরীরের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নুসাইবার খবর নিলেন; তাঁর জরুরী চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন।

নিজ ছেলেকে দ্বীনের পথে উৎসর্গ

মুসলিম মুজাহিদদের বিভিন্ন জিহাদী কাফেলায় উম্মে উমারাহ নুসাইবা বিনতে কাব অংশগ্রহণ করেন। তাঁর অংশহগ্রণ ছিলো তাৎপর্যপূর্ণ। এসব যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি সাহসিকতার দীক্ষা রেখেছেন। তিনি আকাবার শপথে ছিলেন। হুদাইবিয়ায় গাছের নীচে বাইআতে রিদওয়ান-এ উপস্থিত ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিদায়ী হজ্বের কাফেলাতেও ছিলেন।

রাণী যুবাইদা বিনতে জাফর

ইতিহাস প্রান্তিক মানুষেকে স্মরণে রাখে না। বরং সেসব মানুষকে চীরস্মরণীয় করে রাখে যারা সম্মান-মর্যাদা, জ্ঞানে প্রজ্ঞায়, আবিষ্কারে বা বিজয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। এমন একজন স্মরণীয় রাণী যিনি নানান গুণের কারণে ইতিহাসে অনান্যা হয়ে আছেন। আমরা যদি রাজমহলের মহারাণীদের কাহিনী আলোচনা করি, যদি প্রজ্ঞাবতী নারী ও বিশ্বসভায় তাদের অবদান তুলে ধরতে চাই তবে অবশ্যই বাদশা হারুনুর রশীদের স্ত্রী যুবাইদা বিন জাফরের প্রসঙ্গ আলোচিত হবে।

যুবাইদার বংশনামা

যুবাইদা! তিনি ছিলেন প্রখ্যাত আব্বাসীয় খলীফা আল-মানসুর পুত্র জাফরের কন্যা। বংশীয় সূত্রে আব্বাসীয় হাশেমী কুরাইশী। ১৪৫ হিজরি সনে মসুলে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতামহ আবু জাফর মনসুর, তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। প্রীত হয়ে স্নেহনিলয়ে তার শুভ্রতা এবং পুষ্পদীপ্তির জন্য 'যুবাইদাহ' বলে ডাকতেন।

মহিমান্বিতা যুবাইদা নয়জন খলীফার আত্মীয়া ছিলেন। তারা হলেন, তার পুত্র মুহাম্মদ আল আমিন, তার সতীন পুত্র আল-মামুন, তার পতি হারুনুর রশিদ, দু'নাতী ওয়াসিক এবং আল-মুতাওয়াক্কিল, তার চাচা আল-মাহদি, তার দাদা আল-মানসুর, তার পিতার চাচা আবুল আব্বাস আস সাফাহ, তার চাচাতো ভাই আল-হাদি।

সাঁইত্রিশজন খলীফা আব্বাসীয় খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর মধ্যে আরবীয় কন্যার সন্তান ছিলেন মাত্র তিনজন, আবুল আব্বাস আস সাফাহ, আবু জাফর আল-মানসুর এবং তার পুত্র মুহাম্মদ আল-আমিন। বাকিরা অনারব মায়ের সন্তান ছিলেন।

যুবাইদা-পতি খলীফা হারুনুর রশিদ

তার স্বামী খলীফা হারুনুর রশিদ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, হারুনুর রশিদ শ্রেষ্ঠ খলীফা, প্রধানতম সম্রাট। যিনি হজ, জিহাদ, যুদ্ধাভিজান, শৌর্য ও সূক্ষ্ম পরামর্শের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তিনি আলিমদের শ্রদ্ধা করতেন, ভালোবাসতেন। শিক্ষা ও কল্যাণকর কাজে প্রচুর ব্যয় করতেন। দ্বীনি নিদর্শনের গাম্ভীর্য রক্ষা করতেন। বাহাস কুতর্ককে ঘৃণা করতেন। তার বিপুলাকায় সাম্রাজ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায় এ কথায় যে, তিনি বলতেন, "হে মেঘমালা, তোমার যেখানে ইচ্ছা তুমি বারি বর্ষণ করো, কেননা এর উৎপন্নজাত শস্য আমার রাজভোগে সঞ্চিত হবে।"

একবার তার ঘরণী যুবাইদার সাথে মতের অমিল হলে তাকে বলেছিলেন, "আল্লাহর কসম, এ রজনীতে তুমি আমার সাম্রাজ্যে থাকলে তুমি তালাক হয়ে যাবে।" পরবর্তীতে তিনি তার এ কসমের কারণে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত ও অনুতপ্ত হন। অবশেষে তিনি ইমাম আবু হানিফার প্রিয় ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফের সমীপে এ জটিলতার সমাধান তালাশ করে। ইমাম বলেন, যুবাইদা আজ রাতের জন্য মসজিদে থাকবে। মসজিদ আপনার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়, মসজিদ তো আল্লাহর ঘর।" তারপর যুবাইদা আল্লাহর ইবাদত ও তাসবীহ-তাহলীলে ঐ রাত কাটান।

যুবাইদার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব

তিনি গৌরবময় বংশীয় কৌলীন্যের অধিকারী হলেও উদারমতি স্বভাব-প্রকৃতিতে পরিবর্তিত হন। পারিবারিক ঐতিহ্য ও বংশচরিতের আভিজাত্য ছাড়িয়ে নেতৃত্ব ও কৃতিত্বের শিখরে পৌঁছে যান। আশৈশব রাজপ্রসাদে লালিতপালিত হয়েছেন। সে সময় কোন নারী তার সমান মর্যাদাবোধ ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেননি। কোমল কমনীয় স্বভাবের অধিকারী যুবাইদা বিশেষ গুণগুলোতে ছিলেন আব্বাসীয় বংশের তৎকালীন নারীদের মাঝে সবার সেরা। অনুগ্রহ, প্রজ্ঞা, আল্লাহভক্তি, পবিত্রতা ও সভ্যতায় তিনি ছিলেন অনন্যা। কুরআন-সুন্নাহ সমরনীতি ও সাহিত্যজ্ঞানের আঙিনায় তিনি ছিলেন বিচরণশীল ঝলমলে প্রজ্ঞান।

ইমাম যাহাবী বলেন, যুবাইদা ছিলেন পর্দানশীন রাণী, প্রতিপত্তি ও অর্থসম্পদে গরীয়সী, হজের সফরে সপ্রতিভ, তার হেরেমের একশত বিশেষ ক্রীতদাসী ছিলেন যারা হয়েছিলেন আল্লাহর কালাম কুরআনের হাফেজা।
খতিব আল বাগদাদি তার সম্পর্কে বলেন, প্রাজ্ঞজনদের প্রতি খায়েরখাঁ ও অনুকম্পার জন্য রাণী যুবাইদা ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ। তিনি নিঃস্ব ও অভাবীদের প্রতি দরাজদিল ছিলেন।

জনৈক কবি তার সম্পর্কে বলেন,
তিনি গৌরবময় অবদান রেখেছেন, সকল মন্তব্য-আলাপের ঊর্ধ্বে উঠেছেন
তিনি কুরাইশ গোত্রের গৌরবজনকধারা, গোত্রপতির মান ও তার সম্মান সমমান।
তিনি পুণ্যবতী, উদার, একনিষ্ঠ সম্মানীয়া, অনিঃশেষ সুনামের এক সম্ভ্রান্ত গোত্রের কন্যা।

যুবাইদার জীবনের উষালগ্ন

দুর্ভাগ্যক্রমে যুবাইদা মাত্রাতিরিক্ত শানশওকতে লালিত হয়েছিলেন। তার জীবনাচার এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, একবার তার ইচ্ছে জাগলো তাকে রেশমী কাপড়জাত একটি শীতলপাটি তৈরি করে দিতে হবে। যাতে সকল প্রজাতির প্রাণী, পাখির চিত্র স্বর্ণের ঝালরযুক্ত পটে বোনা অমূল্য রত্ন- জহরত খোচিত থাকবে। এ পাটি তৈরি করতে দশ লক্ষ এক স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় হয়েছিলো। তিনি পোশাকআশাকে কেতাদুরস্ত ছিলেন। তদানীন্তন মহিলাসমাজ তার শৈলী-ভঙ্গিতে পরিচ্ছদ পরিধান করতেন। আধুনিকতম কোমরবন্দ, অত্যুচ্চ মূল্যের মুক্তখচিত জুতো ও স্বতন্ত্র নকশা করা জামা পরিধান করতেন। প্রতিটির দাম ৫০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ছাড়িয়ে যেতো।

যুবাইদা ও হারুনুর রশীদের বিয়ে হয়। তাদের বিবাহ এতোটা ব্যয়বহুল ও জাঁকজমকপূর্ণ ছিলো যে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছিলো। এই বিয়ে অনুষ্ঠানে ৫ কোটি ৫০ লাখ স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করা হয়েছিলো। শহরের অলিগলিতে গণভোজের আয়োজন করা হয়েছিল। হ্যাঁ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে আহার করানোকে আমরা সুকর্ম বিবেচনা করলেও রাজকোষের ক্ষয় ও জনগণের মালিকানাধীন অর্থ অপচয়ের ব্যাপারটি ইতিবাচক নয়।

যুবাইদা বিনতে জাফরের নিজস্ব ব্যবসা ছিলো। তার পক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার জন্য তিনি বিভিন্ন ম্যানেজার নিয়োগ করতেন। এই সম্পর্কে একটি ঘটনা আছে, একবার যুবাইদার একজন ম্যানেজার ব্যবসায়িক লেনদেনের পর ঐ অর্থ নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করে ফেললো। ব্যবসা-বাণিজ্যের হিসাব করার পর দেখা গেল তার লেনদেনে প্রায় ২ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার ঘাটতি হয়েছে। ম্যানেজার কিভাবে অনুমতি ব্যতীত অর্থ ব্যয় করার দুঃসাহস দেখালো, তাই যুবাইদা তাকে অতিসত্বর কারণ দর্শানোর তাগাদা দিলেন। দেখা গেলো সেই ম্যানেজার আত্মসাৎকৃত অর্থ পরিশোধ করতে না পারল না। ফলে তাকে কারাগারে পাঠানো হলো। কারারুদ্ধ লোকটি তার পক্ষে মধ্যস্থতা করার জন্য তার সহকর্মীদের নিকট সংবাদ পাঠালেন।

তার বন্ধু ঈসা এবং সাহল বিন আস সালাহ তার পক্ষে সালিশ করার জন্য বের হলে পথিমধ্যে মন্ত্রী আল-ফায়েদ বিন আবি সালেহ-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। এরপর তারা তিনজন একত্রে যুবাইদার প্রধান ম্যানেজার দাউদের নিকট আগমন করলেন। তারা তার সাথে তাদের সহকর্মীর বিষয়টি নিয়ে আলাপ করলেন। তিনি যুবাইদাহর পরামর্শগ্রহণের জন্য বার্তা প্রেরণ করলেন। তখন যুবাইদা তার প্রধান হিসাবরক্ষককে এ তিনজনের সহকর্মীর আত্মসাৎকৃত অর্থের হিসাব দিতে বললেন এবং সাথে সাথে স্পষ্টভাবে জানিয়েও দিলেন যে, পাওনা টাকা পরিশোধ না করা পর্যন্ত তার মুক্তির কোনো সম্ভাবনা নেই।

ঈসা ও সাহল বিন আস আত্মসাৎকৃত অর্থের সমপরিমাণ শোধ করতে অক্ষম ছিলেন। তবে ফায়েদ বিন আবি সালেহ বদান্যতায় আপ্লুত হয়ে যুবাইদার প্রধান ম্যানেজার দাউদকে বললেন যে, তিনি কারাগার থেকে মুক্তিপণ বাবদ পুরো অর্থ বহন করবেন। প্রধান হিসাবরক্ষক এই সংবাদটি যুবাইদার কাছে পৌঁছুলে যুবাইদা বললেন, আমি ফয়েদ্ব বিন আবি সালেহের চেয়ে এই উদারতা প্রদর্শনের অতি যোগ্য। তখন যুবাইদা আত্মসাৎকৃত অর্থ জমাখরচের খতিয়ানে প্রদান করে, অভিযুক্ত লোকটির পক্ষে পরিশোধ করে দিলেন। ঐ অভিযুক্ত ম্যানেজারকে সতর্ক করে দিলেন যেন এ অপরাধের কোন পুনরাবৃত্তি না ঘটে।